দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 05 SEP 2016

ড. শরীফ এনামুল কবির

জাতি গঠনে শিক্ষা

এই ভূতের আখড়া যতদিন ভাঙা সম্ভব না হবে ততদিন শিক্ষা ব্যবস্থার এই অবর্ণনীয় অব্যবস্থাই বিদ্যমান থাকবে। সমৃদ্ধ জাতি গঠনে শিক্ষার বিকল্প নেই। এটি হতে হবে মানসম্মত। প্রাথমিক অবস্থাতেই শিক্ষার মানের সঙ্গে আপস করলে পরিণতি ভয়াবহ হবে বলাই বাহুল্য

শিক্ষা নিয়ে, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে কথার শেষ নেই—শেষ হচ্ছেই না। প্রশ্নও দেখা দিচ্ছে নিত্য নতুন। প্রথম প্রশ্ন, শিক্ষা বলতে তত্ত্ব, তথ্য, পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ জ্ঞানকেই বুঝবো? না কে কতো বেশি নম্বর পেয়ে বড় বড় সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পেরেছে তাই বুঝবো? আমাদের শিক্ষার হার বেড়েছে। শিক্ষার সকল পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বেড়েছে অনেক। এই যে বাড়তি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এটা আশাব্যঞ্জক না হয়ে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। যিনি জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভে ব্যর্থ হয়েছেন তিনিও আয়ের উপায় নির্ধারণ করে একটি স্কুল খুলে বসে আছেন। শুরুটা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র থেকেই। আগে কোনো কোনো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার অধীনে সারা দেশে কিছু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র চালু ছিল। তাদের অধীনে মনে হয় এখনো কিছু এমন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তবে সেগুলো ছিল, অপেক্ষাকৃত কম অগ্রসর অঞ্চলগুলোতে। শিক্ষায় অনাগ্রহী জনপদের টিফিন, রঙিন বই, পেন্সিল, লেখার খাতাসহ আরো কিছু অনুষঙ্গ দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানে বাচ্চাদের শেখানো হতো। পরবর্তীতে এটা কিছু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও চালু করা হয়। অসচেতন অভিভাবক, অতিদরিদ্র পিতামাতা বা অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য এটা বেশ ইতিবাচকই। তবে এগুলোকে ছাপিয়ে এখন ভয়ংকরভাবে বিস্তৃত হয়েছে কিন্ডার গার্টেনের বাণিজ্যিক প্রসার। ওষুধে ভেজাল প্রাণনাশের শঙ্কা জাগায়, শিক্ষার ভেজাল জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে দেখা দেয়। যদি তা জীবনের শুরুতেই হয় তবে তো অঙ্কুরেই বিনষ্ট।

স্বাভাবিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভের আগের সময়টাই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সময়কাল। ছয় বছরের বাচ্চাদের শিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। সাধারণত তিন থেকে পাঁচ/ছয় বছর বয়সী শিশুদের শারীরিক, মানসিক বিকাশের সঙ্গে শিক্ষার সমন্বয় সাধনের কাজটি করা হয়ে থাকে। খেলাধুলা, আনন্দ, অক্ষরজ্ঞান এবং গণনার হাতেখড়ির মাধ্যমে তাদের আচরণ উন্নয়নে নজর দেওয়া হয়। কিন্ডার গার্টেন স্কুলের মতে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে সাধারণত দুটি ধাপে বিভক্ত করা হয়। ৩-৫ বছরের শিশুদের জন্য নার্সারি/প্লে গ্রুপ বা প্রাক-কিন্ডার গার্টেন এবং ৫-৬ বছরের শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক বা কিন্ডার গার্টেন। অবশ্য, কোনো কোনো স্কুলে ৩-৪ বছরের শিশুদের জন্য প্লে গ্রুপ, ৪-৫ বছরের শিশুদের জন্য নার্সারি, ৫-৬ বছরের শিশুদের জন্য কেজি-১ এবং ৬-৭ বছরের শিশুদের জন্য কেজি-২ শ্রেণিতে শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। সম্প্রতি নার্সারি বা কিন্ডার গার্টেন স্কুলের আদলে ছোট শিশুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের অজ্ঞাতে হচ্ছে এ সব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর কারও অনুমতির প্রয়োজন হয় না এই ব্যবসার জন্যে। অথচ একটি ব্যবসা আরম্ভ করবার জন্যে স্থানীয় সরকার সংস্থার অনুমতি আবশ্যক। শিক্ষাদান তবে কী মনোহারী দোকানের চেয়ে সহজ কাজ, কম গুরুত্বপূর্ণ?

কুদরাত-ই-খুদা (১৯৭৪) এবং মফিজউদ্দিন আহমেদ (১৯৮৮)-এর নেতৃত্বাধীন শিক্ষা কমিশন শিশুদের শিক্ষার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছে। এই শিক্ষা কমিশন শহর ও শিল্প এলাকায়, বিশেষত যাদের অভিভাবকগণ বাইরে কাজ করেন, সে সকল শিশুদের জন্য নার্সারি ও কিন্ডার গার্টেন প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। মফিজউদ্দিন কমিশন যেখানে বেসরকারি উদ্যোগ নেই এরূপ সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুশ্রেণি খোলার সুপারিশ করে। ১৯৯৫ সালে গঠিত সবার জন্য শিক্ষা-সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি 'সবার জন্য শিক্ষা' লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ছোট শিশুদের শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি সুপারিশ পেশ করে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য ১৯৯৭ সালে গঠিত কমিটিও সুপারিশ করে যে, ১ম শ্রেণির প্রথম ছয়মাস প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা যায়। কমিটি শিশুদের শিক্ষা দানের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলা শিক্ষকদের নিয়োগ করারও পরামর্শ দেয়। এই সুপারিশ ময়লার অতলে ডুবে থাকা ফাইলেই আটকা পড়ে থাকে—তা বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ নেই। সরকারের নির্দেশ থাকলেও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্তরের অফিসগুলো কর্তব্যের চাপে এই সব কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ দেবার সময় পান না। কার্যকর প্রাথমিক শিক্ষায় কমিশন সুপারিশ করলেও তার অপব্যবহার হচ্ছে। শিক্ষার প্রসার, শিশুদের শিক্ষায় আগ্রহী ও অভিভাবকদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে এ সুপারিশ করা হলেও বর্তমানে তা হয়ে গেছে বাণিজ্যিক। বর্তমানে সারা দেশে প্রায় অর্ধ লক্ষের মত কিন্ডার গার্টেন একাডেমি রয়েছে। এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কোনো ধরনের নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই। শিক্ষা ব্যবস্থার মতো অনিয়মের রাজ্যে এখানেই নিয়ম থাকতে হবে কেনো?

বর্তমানে শহর এলাকায় ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে ওঠেছে কিন্ডার গার্টেন, ক্যাডেট স্কুল এবং মাদ্রাসা। শিক্ষার মানোন্নয়ন নয় ব্যবসাই মূল লক্ষ্য এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মালিকদের। ছোট পরিসরে গাদাগাদি করে বসিয়ে পাঠদান, অদক্ষ ও তুলনামূলক বিবেচনায় স্বল্প শিক্ষিত শিক্ষক দ্বারা পাঠদান, সরকারের পাঠ্য বইয়ের তুলনায় নিজেদের বইকে প্রাধান্য দেওয়া এবং অতিরিক্ত

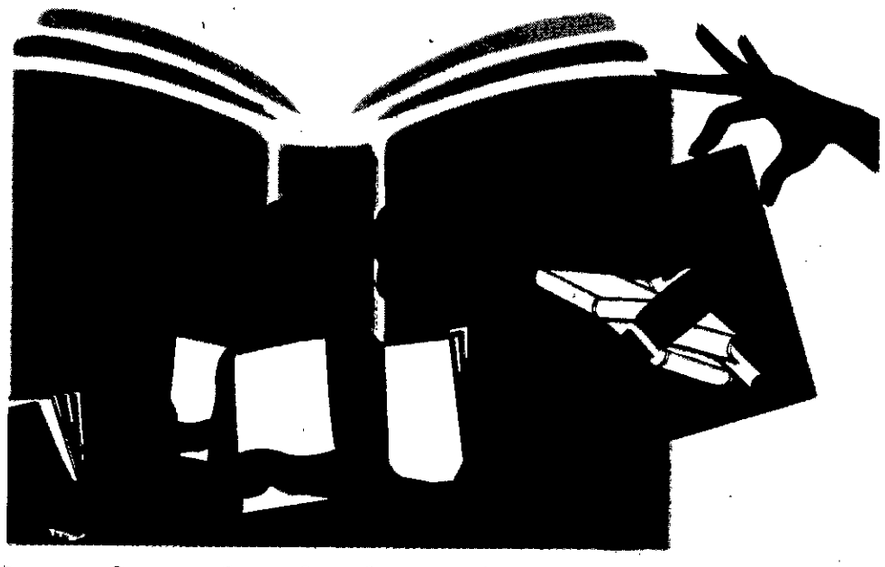

বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সঠিকভাবে তুলে না ধরা, অসহনীয় ভর্তি ফি আদায়, অতিরিক্ত মাসিক বেতন, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষার নামে মাসে মাসে পরীক্ষা ফি আদায়, শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর আগে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন না করার অভিযোগ রয়েছে এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। এমনকি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিও প্রদর্শন করা হচ্ছে না ব্যক্তি পর্যায়ের এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। দেশব্যাপী সরকারি বেসরকারি স্কুলগুলোয় টিউশন-ফি, সেশন চার্জ ও ভর্তি-ফি আদায় নিয়ে নৈরাজ্য চলছে। প্রতিষ্ঠানগুলো ইচ্ছেমতো ফি আদায় করছে। এ নিয়ে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকলেও তা কেউই মানছে না। শিক্ষা প্রশাসনও অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। কিন্ডার গার্টেন স্কুলসমূহের জন্য কোনো একক বা সাধারণ পাঠ্যক্রম নেই। নেই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কোনো দিক-নির্দেশনাও।

এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য নেই বড় কোনো ভবন। একটি ভবনের কয়েকটি ছোট কক্ষে আয়োজন করা হয় পুরো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম। আবার ছোট রুমগুলোর মাঝে পার্টিশন দিয়ে বিভক্ত করা হয়। বানানো হয় দুটি শ্রেণিকক্ষ। একপাশে জানালা, অপর্যাপ্ত আলো আর সেই আলো পুষিয়ে নেওয়ার জন্য দিনের বেলায় জ্বালানো হচ্ছে কৃত্রিম আলো, ক্লাস চলাকালীন বারান্দা থেকে বাইরের ধুলাবালু কক্ষের মধ্যে প্রবেশ কিংবা ব্ল্যাকবোর্ডে ব্যবহার করা চকের গুঁড়া ঢুকে পড়ছে নাকেমুখে, হাঁচি উঠছে সবার একসঙ্গে। একটু ক্লাস করেই হাই তুলছে বড় করে। পড়া দেওয়া, পড়া ধরার কোনো রেওয়াজ এসব প্রতিষ্ঠানে নেই, মুখস্থ করা, পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়াই হয়ে উঠছে সবার কাছে একমাত্র মুখ্য বিষয়। নম্বরকে আমরা সোনার মূল্যে ক্রয় করি বলেই না গোল্ডেন *-এ প্লাস* নামের একটি মাত্রা যোজিত হয়েছে ফলাফলের ঘরে। নম্বরের কদর বাড়াতে জ্ঞানের কদর গেছে কমে— এতে দোষের কিছু নেই। সুতরাং কিন্ডার গার্টেন নামক বদ্ধঘরে কোনোক্রমে প্রবেশ করতে পারলে গোল্ডেন হওয়া যায়।

পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি শিশুর সুষ্ঠু মনন বিকাশে তার চারপাশের পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্তমানে একদিকে যেমন আমরা সৃজনশীলতার নামে শিশুদের কাঁধে দিনকে দিন বইয়ের বোঝা বাড়িয়েই চলেছি, অন্যদিকে তাদের জন্য আনন্দময় ও পরিবেশবান্ধব স্বাস্থ্যসম্মত শিক্ষার পরিবেশ ঠিক সেভাবে তৈরি করতে পারছি না। দেশে বর্তমানে শিশুশিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও নকশা নিয়ে অনেক গবেষণা হলেও তা রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে না। অন্য কথায় বলা যায়, সঠিক পন্থায় সেগুলো কাজে লাগাতে পারছি না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা অরাজকতা বিরাজমান। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে চলছে বহুমাত্রিক ধারা। সরকার চালিত বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম বোর্ড (এনসিটিবি), মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড, আবার এনজিও এবং কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যক্রম প্রণীত হয় তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার উপর। এসব প্রতিষ্ঠানে ইচ্ছেমতো বিভিন্ন শ্রেণিতে পাঠ্যবইয়ের সংখ্যা বাড়াচ্ছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিশুদের নির্ধারিত তিনটির বাইরে আরো ছয় থেকে ১০টি বই দেওয়া হয়। কিন্ডার গার্টেন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণি শিশু শিক্ষার্থীরা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় আরো অনেক বই পড়ছে। বিভিন্ন স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে বোর্ডের বাংলা, ইংরেজি, গণিতে তিনটি বিষয়ের সঙ্গে সহায়ক হিসেবে ধর্ম, পরিবেশ-পরিচিতি, বিজ্ঞান, ওয়ার্ড বুক, চিত্রাঙ্কন, বাংলা ও ইংরেজি হাতের লেখা শেখার, সাধারণ জ্ঞান, নামতা-গুণ-ভাগ-জ্যামিতি আছে এমন একটি গণিত বই, ব্যাকরণ, ইংরেজি গ্রামার, গল্প ও কবিতার এবং কম্পিউটার শিক্ষা সংক্রান্ত বই দেওয়া হয়ে থাকে। স্কুলভেদে এসব বইয়ের সংখ্যা ও বিষয় কম-বেশি হয়ে থাকে। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, বিজ্ঞান ও ধর্ম ছয়টি সরকারি বইয়ের সঙ্গে সহায়ক হিসেবে দেওয়া হয় ব্যাকরণ, ইংরেজি গ্রামার, কম্পিউটার, চিত্রাঙ্কন, দ্রুতপঠন ধরনের দুই থেকে ছয়টি বই। এতো বই কী খুব বেশি প্রয়োজন? না। লেখক, প্রকাশক ও স্কুল মালিকের সিন্ডিকেট জন্ম দিচ্ছে এই সব বইয়ের দীর্ঘ তালিকা।

সংবিধান ও জাতীয় শিক্ষানীতিতে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বৈষম্যহীন ও একই মানের করার কথা বলা হয়েছে। সরকার নির্ধারিত বইয়ের বাইরে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়তি বিষয় পাঠ্য করতে চাইলে তার জন্য শিক্ষা অধিদপ্তরের অনুমতি নেওয়ার কথা বলা আছে। 'প্রথম শিক্ষা আইন-২০১৩'-এর চূড়ান্ত খসড়ায় বলা হয়েছে, প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণির শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণয়ন করবে। বোর্ডের অনুমতি ছাড়া শিক্ষাক্রমে অতিরিক্ত কোনো বিষয় বা পাঠ্যবই অন্তর্ভুক্ত করলে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অনধিক দুই লাখ টাকা জরিমানা অথবা ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড দেওয়া হবে। অভিযোগ রয়েছে যে, এনসিটিবি নামক সরকারি প্রতিষ্ঠানটি আর এক ব্যবসাকেন্দ্র—সমগ্র দেশ থেকে ঘুষের বিনিময়ে বদলি হয়ে সরকারি কলেজের শিক্ষকগণ এখানে এসে লেখক প্রকাশকের সঙ্গে ব্যবসা ফাঁদেন। কোন্ বই অনুমোদন পাবে, কোন্ প্রকাশকের বই পাঠ্য হবে এই রুটি বণ্টন করেন এনসিটিবি'র ক্ষমতাবান কর্তাব্যক্তিগণ। সে সব তথ্য প্রকাশ করতেও লজ্জাবোধ হয়। এই ভূতের আখড়া যতদিন ভাঙা সম্ভব না হবে ততদিন শিক্ষা ব্যবস্থার এই অবর্ণনীয় অব্যবস্থাই বিদ্যমান থাকবে। সমৃদ্ধ জাতি গঠনে শিক্ষার বিকল্প নেই। এটি হতে হবে মানসম্মত। প্রাথমিক অবস্থাতেই শিক্ষার মানের সঙ্গে আপস করলে পরিণতি ভয়াবহ হবে বলাই বাহুল্য। তার জন্যে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট দপ্তর, অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সংস্থাকে গোছানো—অভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিচালনা করা।

● **লেখক : সদস্য, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন**
সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : skabir_ju@yahoo.com